গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ জানুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

চাঁদনি চক, কলকাতা

কার্জন গেট, বর্ধমান

পার্ক সার্কাস, কলকাতা

২০ জানুয়ারি। সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে রাজ্য জুড়ে মানব-বন্ধন

অন্যায় যারা করে তারাই প্রতিবাদকে ভয় পায়

ভয় পাচ্ছে শাসক বিজেপি। প্রতিবাদের নাম শুনলেই এখন তাদের ভয়। সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন দূরের কথা, সামান্য একটা মিছিল, ধরনা কিংবা এমনকি কোথাও কেউ জড়ো হয়ে সংবিধানের দুটো লাইন পড়লেও বিজেপি নেতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন— এই বোধহয় গদি তাঁদের টলমল করে উঠল।

রাজধানী দিল্লির কথাই ধরা যাক। জামা মসজিদের সামনে সিএএ-এনআরসি বিরোধী এক জমায়েত থেকে এক আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে ঢোকায়। প্রায় পঁচিশ দিন জেলে থাকার পর জামিনের জন্য কোর্টে আবেদন জানালে বিচারপতি পুলিশের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ জানতে চান। পুলিশ উত্তর দেয়, তিনি সোসাল মিডিয়ায় জামা মসজিদের ধরনায় যোগদানের জন্য মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। বিচারক বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, "এর মধ্যে কী দোষ রয়েছে? এর মধ্যে হিংসা কোথায়?" তিনি বলেন, "ধরনা দিলে কী সমস্যা? প্রতিবাদ হলেই বা কী সমস্যা?" পুলিশ সাফাই গাইতে অজুহাত তোলে, প্রতিবাদকারীরা প্রতিবাদের অনুমতি নেয়নি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "কীসের অনুমতি? প্রতিবাদ করাটা তো সাংবিধানিক অধিকার।"

দিল্লির শাহিনবাগে এনআরসি বিরোধী গণ অবস্থানে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামল

প্রতিবাদের অধিকার যে প্রতিটি মানুষের অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার, এ কথা কি বিজেপি নেতা-মন্ত্রী কিংবা তার পুলিশ-প্রশাসন জানে না? খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু প্রবল গণবিক্ষোভে গদি টলে যাওয়ার আতঙ্ক যখন

দুয়ের পাতায় দেখুন

অত্যাচারের মুখেও লড়াই চালাচ্ছে মানুষ

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র ১৮ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "বিজেপি সরকারের জনবিরোধী এবং গণআন্দোলন বিরোধী চরিত্র ফের সামনে এসে গেল। এলাহাবাদের সর্দার প্যাটেল ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত সিএএ বিরোধী এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছিলেন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধে পদত্যাগী আইএএস অফিসার কান্নন গোপীনাথন। উত্তরপ্রদেশের সরকারি প্রশাসন তাঁকে সেই সম্মেলনে যেতে বাধা দিয়েছে এবং জোর করে দিল্লিতে ফেরত পাঠিয়েছে।"

"অন্য দিকে, লক্ষ্ণৌ চকে ছাত্রদের যে সিএএ বিরোধী শান্তিপূর্ণ ধরনা চলছে, পুলিশ সেখান থেকে কম্বল, খাবার ইত্যাদি কেড়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই সরকার জনবিরোধী এবং গণতন্ত্রবিরোধী। পুলিশকে দলদাসে পরিণত করেছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। বিরোধীরা যাতে মুখ খুলতে না পারে সে জন্য এই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করছে এবং পুলিশ দিয়ে চূড়ান্ত হয়রান করছে, যা ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

"আশার কথা, বিজেপি সরকারের এমন আক্রমণ সত্ত্বেও আন্দোলনকারী জনতার লড়াকু মানসিকতা অটুট রয়েছে, দেশ এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার লড়াই জারি রয়েছে। গণতন্ত্রপ্রিয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সকল মানুষকে এই গণআন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।"

পাল্টা প্রশ্ন করুন, রুখে দিন এনআরসি-সিএএ-এনপিআর

কলকাতা নাগরিক কনভেনশনের আহ্বান

আপনাদের যা খুশি বুঝিয়ে চলেছে সরকার। মানুষের উচিত পাল্টা প্রশ্ন করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মাথা নিচু করে অন্যায় ফরমান মানুষ মেনে নেবে না। কলকাতা জেলা এনআরসি-সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশনে এ কথা বলে গেলেন কান্নন গোপীনাথন। এই তরুণ কিছুদিন আগে মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আইএএসের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

১৪ জানুয়ারি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন প্রতিবাদের কণ্ঠকে তুলে ধরতে। সভার শুরুতেই এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে নানা রাজ্যে এনআরসির আতঙ্কে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে অমানুষিক পরিবেশে থেকে মারা গেছেন এবং আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন অংশুমান রায়।

কান্নন গোপীনাথন শ্রোতাদের সাথে নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এনআরসি-সিএএ-র বিপদের দিক তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আজ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। সরকারের শক্তির থেকে জনগণের শক্তি অনেক বড়। সেটাই নির্ণায়ক শক্তি। তাই এই বিপদের বিরুদ্ধে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাহলে এই আন্দোলনকে কেউই রুখতে পারবে না।

মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র বলেন

চারের পাতায় দেখুন

অন্যায় যারা করে তারাই প্রতিবাদকে ভয় পায়

একের পাতার পর

কোনও স্বৈরাচারী শাসককে তাড়া করে তখন লাঠি-গুলিই হয় তেমন শাসকের একমাত্র হাতিয়ার। শাসক বিজেপিরও আজ দেশের মানুষকে লাঠি-গুলি, দমন-পীড়ন ছাড়া দেওয়ার আর কিছু নেই। তাই জেএনইউ-এর ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিজেপি সরকারের পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায়। জামিয়া মিলিয়াতে ছাত্রদের হোস্টেলের মধ্যে, লাইব্রেরিতে ঢুকে মেরে তাদের হাত-পা ভাঙে, মাথা ফাটায়, চোখ নষ্ট করে দেয়। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের পুলিশ নিজেরা ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে জনসাধারণের উপর সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের দায় চাপায়। অথচ শাসক দল আশ্রিত সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা যখন সমস্ত রকম নজরদারিকে থোড়াই কেয়ার করে জেএনইউতে ঢুকে ছাত্র-শিক্ষকদের উপর নির্মম আক্রমণ চালায় তখন পুলিশ কাঠের পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে। মোদি সরকারের স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করা আইএএস গোপীনাথন কান্নান এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক সভায় যোগ দিতে গেলে পুলিশ তাঁকে বিমানবন্দরেই আটকে দেয়। লখনৌতে প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে ধরনায় বসা মানুষের থেকে কম্বল এবং খাবারের প্যাকেটগুলিও জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় যোগী সরকারের পুলিশ।

দিল্লি জুড়ে বিজেপি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে যাতে এনআরসি-সিএএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য কেউ জমায়েত হতে না পারে। এতেও ভয় ঘোচেনি। জারি করেছে নতুন কালা আইন এনএসএ। এই আইনে পুলিশ কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং এক বছর বিনা বিচারে আটকে রাখতে পারে।

বাস্তবে, যত অন্যায়ই হোক, মোদি সরকার তার নীতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে তাদের মত প্রকাশ করতে দিতে রাজি নয়। কিন্তু এ তো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার! সে অধিকারটাই কেড়ে নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু মানুষের স্বাধীন মতামতকে কেন এত ভয় বিজেপি নেতাদের? কেন ভয় গণতান্ত্রিক অধিকারকে? আসলে তাঁরা জানেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন অন্যায়ের উপর। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের যে নীতি তাঁরা পার্লামেন্টে শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে পাশ করিয়ে নিয়েছেন তা অন্যায়, গণতন্ত্র বিরোধী। তার পিছনে আসল মতলব একটি বিশেষ ধর্মের মানুষকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা এবং এই পথে হেঁটে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুরু অংশের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। দেশজুড়ে শুভবুদ্ধির মানুষমাত্রেই এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট নীতির প্রতিবাদ করছেন। প্রতিবাদ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র-শিক্ষক-চিকিৎসক-বিজ্ঞানী-ইতিহাসবিদ-লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-অভিনেতা-নাট্যকর্মী-বুদ্ধিজীবী সব স্তরের মানুষের মধ্যেই।

ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়স-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে এই প্রতিবাদকেই ভয় পাচ্ছে বিজেপি। তারা এক ভারতের নামে কাশ্মীরি মানুষের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তিকে গায়ের জোরে লোপ করেছে। প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, ইন্টারনেট সংযোগ বাতিল করেছে। অযোধ্যায় কোনও নীতি, যুক্তি কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণের তোয়াক্কা না করে শুধু বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে রামমন্দির নির্মাণকে আইনসিদ্ধ করেছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ নীরব থেকেছে। এই নীরবতাকে সমর্থন ভেবেছে বিজেপি। ভেবেছে মানুষ মেনে নিয়েছে, সংখ্যালঘুরা ভয় পেয়েছে। মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখার অন্যায়-জোরের উপর ভর করে আরও এক কদম এগিয়ে যখন বিজেপি নেতারা সীমাহীন ঔদ্ধত্যে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল সুরকে, সম্প্রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যকে দু'পায়ে মাড়িয়ে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের কর্মসূচি অনুযায়ী দেশজোড়া মানুষকে ধর্মের নামে ভাগ করতে উদ্যত হল তখন আর মানুষ চুপ করে থাকতে পারল না। ফুঁসে উঠল আসমুদ্রহিমাচল। এমন সব স্তর থেকে প্রতিবাদ উঠে এল যাঁরা ইতিপূর্বে কোনও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদে নামেননি। ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে যে প্রবল অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে শাসক বিজেপি এবং সংঘ পরিবার, তাতে প্রতিবাদে মুখর হওয়া সহজ কাজ নয়। পুলিশ-প্রশাসন, শাসক দলের ভাড়াটে বাহিনীর শারীরিক-মানসিক লাঞ্ছনা-নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। তা সত্ত্বেও মানুষ সর্বত্র দলে দলে পথে নামছেন প্রতিবাদে।

সরকার হিসাবে বিজেপির ব্যর্থতা আজ সর্বব্যাপক। জনগণকে দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি বিজেপি রক্ষা করতে পারেনি। মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া, বেকারি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে চলেছে। কৃষকের আত্মহত্যা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পুঁজিপতিরা জনগণের সম্পত্তি অবাধে লুঠ করে চলেছে। দুর্নীতি আজ বিজেপির নীতির সমার্থক হয়ে গিয়েছে। বিজেপির আর্থিক নীতিতে জনজীবনে চরম সংকট নেমে এসেছে। এই নীতি শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করছে। এই অবস্থায় শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ যাতে সংগঠিত বিক্ষোভের আকার না নেয়, তার জন্য মানুষকে 'বিভক্ত করে শাসন করা'র শাসক শ্রেণির অতি পুরাতন কায়দাকেই বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে। একদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার, অন্য দিকে পুঁজিপতি শ্রেণিকে গণবিক্ষোভ থেকে রক্ষা করার শেষ আশ্রয় হিসাবে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতির আশ্রয় নিয়েছে। তার জন্যই ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্বের নীতি নিয়ে এসেছে তারা। নিয়ে এসেছে এনআরসির মতো নীতি যাতে আতঙ্কিত মানুষ জীবনের সমস্যাগুলির কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে দেশের নাগরিক প্রমাণ করার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু শাসকরা যা ভাবে তাই যদি ঘটত তবে সভ্যতার ইতিহাস আজ অন্য রকম হত। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, সাময়িক ভাবে শাসকরা হয়ত কখনও কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদকে দমিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা বেশি দিনের জন্য নয়। তাই যতই বিজেপি সরকার জনগণের উপর দমন-পীড়ন নামিয়ে আনছে, নানা অজুহাতে জেলে ভরছে, সোসাল মিডিয়ায় তাদের সংগঠিত বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে মর্যাদাহানি করছে, হুমকি দিচ্ছে, সে সব কিছুকে উপেক্ষা করে মানুষ ততই বেশি বেশি করে পথে নামছে। এমনই হয়। মানুষের স্বাধীনচিত্ততাকে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর স্বাভাবিকতাকে কখনও চোখ রাঙিয়ে, অত্যাচার করে দমিয়ে রাখা যায় না। কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যেই রয়েছে মনুষ্যত্বের যথার্থ প্রকাশ। পরাধীন ভারতে যখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ক্ষমতায় ছিল সেদিনও তাদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচার যত তীব্র হয়েছে ততই দেশজোড়া মানুষ জেগে উঠেছে। স্বাধীন ভারতেও শাসকদের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বারে বারে আন্দোলনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে মানুষ। শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের পক্ষে মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতার কাছে শাসকদের হার মানতে হয়েছে।

এবারের প্রতিবাদের একটি বিশিষ্টতা আছে, যা শাসক বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক নীতির গালে থাপ্পড় কষিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে বিভেদের প্রাচীর গড়ে দেওয়ার জন্য যে নীতি সরকার নিয়ে এসেছিল, সেই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনেই হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠছে। দিল্লির শাহিনবাগে, লখনৌয়ে, কলকাতার পার্ক সার্কাসে, জাকারিয়া স্ট্রিটে, বেলগাছিয়ায়, আসনসোলে, এমন অজস্র জায়গায় যে গণঅবস্থান দিনের পর দিন চলছে, তাতে হিন্দু-মুসলমান দিনরাত পাশাপাশি বসে প্রতিবাদ ঘোষণা করছে। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেও পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের যে প্রাচীর স্থায়ী হয়েছিল, শাসকের আক্রমণের সামনে প্রতিরোধের নতুন প্রাচীর গড়তে গিয়ে সেই পুরনো প্রাচীর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। জন্ম হচ্ছে নতুন মানুষের। যে মহিলারা বোরখার নিচে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে জীবনের অনেকটা অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন, তাঁরাও আজ আন্দোলনের প্রকাশ্য ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদকে ধ্বনিত করছেন। একই মঞ্চে হিন্দু পুরোহিতের পাশাপাশি মুসলমান মৌলবি ঘোষণা করছেন, এই লড়াই শুধু মুসলমানের নয়, শুধু হিন্দুর নয়, এ লড়াই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণে এই প্রতিবাদগুলি গণআন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে সমাজ জুড়ে। আজ দরকার এগুলিকে সংগঠিত রূপ দেওয়া, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আন্দোলনগুলিকে সঠিক নীতি এবং নেতৃত্বে একত্রিত করে দেশজোড়া ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ দেওয়া।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র বীরভূম জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য, জননেতা কমরেড মঙ্গল হেমরম দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাতেই আশেপাশের গ্রামের বহু গুণমুগ্ধ মানুষ, পাথর খাদানের শ্রমিক এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত হন। পরদিন মুরারই পার্টি অফিসে সকাল থেকেই শত শত মানুষ, জেলার নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। মরদেহ পৌঁছালে এক শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চোখের জলে সুশৃঙ্খল ভাবে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক, অন্যান্য দলের সদস্য, সাধারণ মানুষ এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন মাল্যদান করে তাঁদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানান। সর্বশেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গেয়ে তাঁদের প্রিয় মঙ্গলদাকে বিদায় জানান। তাঁর মরদেহ গ্রামে পৌঁছালে বহু মানুষ শেষযাত্রায় অংশ নিয়ে তাকে সমাহিত করেন।

কমরেড মঙ্গল হেমরম ১৯৬৮ সালে স্কুল ছাত্রাবস্থায় প্রয়াত সংগঠক কমরেড মাধব রায়চৌধুরীর মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে ছাত্র সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়াত নেতা কমরেড জিয়াদ বক্সী, কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলই জীবন এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। দল পরিচালিত গণআন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও গ্রামীণ মজুর, বিড়ি শ্রমিক, পাথর খাদানের শ্রমিক সহ নানা অংশের শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে বহু লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলেন। পাশাপাশি মনীষী চর্চা, নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালনা করতেন। পড়াশোনা এবং তত্ত্বচর্চার প্রতি আগ্রহ ছিল খুবই। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দরদি মন বিশেষত অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং যে কোনও প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানো— এমন বহু গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীল মন, দলের অভ্যন্তরেও ছোটদের প্রতি তার ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই সব চারিত্রিক গুণের জন্য যখন যেখানেই গেছেন, মানুষের মধ্যে একটা গভীর ছাপ ফেলেছেন এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা থেকে বহু মানুষ দলের সমর্থক দরদিতে পরিণত হয়েছেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বুঝতেও পারেননি, দু'মাস আগে পর্যন্ত দলের স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে গেছেন। হঠাৎ অসুস্থতা এবং মৃত্যুতে দলের কর্মী এবং এলাকার মানুষ স্তম্ভিত। সকলেই গভীর বেদনাহত। তাঁর মৃত্যুতে দলের যেমন অপূরণীয় ক্ষতি হল, এলাকার মানুষও তাঁদের একান্ত বন্ধু এবং প্রিয়জনকে হারালেন।

কমরেড মঙ্গল হেমরম লাল সেলাম

পশ্চিম বর্ধমান জেলার লাউদোহা লোকাল কমিটির সক্রিয় কর্মী কমরেড শিকলাল বাউরী দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৭ ডিসেম্বর মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পাড়া-প্রতিবেশী এবং কমরেডরা শোকে ভেঙে পড়েন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী, লোকাল সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী সহ অন্যান্য কমরেডরা কুড়ুলিয়াডাঙা দলীয় অফিসে উপস্থিত হন এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

২৮ ডিসেম্বর কুড়ুলিয়াডাঙায় দলীয় অফিসের সামনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণা করেন কমরেড শিবদাস বাউরী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী। দলের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, আত্মমর্যাদাবোধ, তাঁর সাহস, অসুস্থ অবস্থাতেও দলের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে তাঁর উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের কথা, কোনও ব্যক্তিগত-সুবিধা, ধমকির কাছে মাথা নত না করা, কারও দয়া-করুণার উপর নির্ভর না করার মানসিকতা প্রভৃতি গুণের দিকগুলি নেতারা বক্তব্যে তুলে ধরেন। দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সমস্ত নেশার দ্রব্য বর্জন করা এবং গরিব মানুষের আপনজন হয়ে ওঠার নানা স্মৃতিকথা সভায় আলোচিত হয়।

কমরেড শিকলাল বাউরী লাল সেলাম

প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা রচনার মুখবন্ধ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৮৩ সালে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচনা করেন 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা'। এতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা দেন তিনি। রচনার মুখবন্ধে সমগ্র বিষয়টি চুম্বকে তুলে ধরেছিলেন এঙ্গেলস। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে মুখবন্ধটি প্রকাশ করা হল। এবার চতুর্থ তথা শেষ কিস্তি।

যাই হোক, যা কিছু সৃষ্টি হয় তাই একদিন ধ্বংস হয় (''অল দ্যাট কামস ইনটু বিয়িং ডিজার্ভস টু পেরিশ'' ঃ গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে উদ্ধৃত - সম্পাদক)। কোটি কোটি বছর কেটে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ প্রজন্মের জন্ম ও মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু অমোঘ নিয়মে এমন একটা সময় আসবে, যখন সূর্যের ক্রমাগত কমতে থাকা উত্তাপ মেরুপ্রদেশ থেকে এগিয়ে আসা বরফ গলাতে পারবে না। মানুষ বেশি বেশি করে নিরক্ষীয় এলাকায় জড়ো হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও বেঁচে থাকার উপযুক্ত তাপ পাবে না। যখন জীবজগতের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যাবে, আমাদের পৃথিবী তখন নির্বাপিত চাঁদের মতো জমে যাওয়া একটা গোলক হিসাবে নিভে যাওয়া সূর্যের চারপাশে গভীরতম অন্ধকারে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একদিন তার ওপরে গিয়ে পড়বে। কোনও কোনও গ্রহের এই অবস্থা হবে পৃথিবীর আগেই, কোনটার হবে পরে। সুসংবদ্ধ রূপে সাজানো গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে তৈরি উজ্জ্বল, উত্তপ্ত সৌরজগতের বদলে একটা ঠাণ্ডা, মৃত গোলক মহাশূন্যের মধ্যে তার নিঃসঙ্গ পথ পরিক্রমা করতে থাকবে। আমাদের সৌরজগতের যে পরিণতি হবে, আগে হোক বা পরে, সেই একই পরিণতি হবে মহাজাগতিক দ্বীপের অন্যান্য জগতগুলিরও। অসংখ্য যে মহাজাগতিক দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে— এমনকি যেগুলির আলো, পৃথিবীতে সে আলো দেখার মতো জীবন্ত মানুষ থাকতে থাকতে কখনও এসে পৌঁছবে না— সেগুলির প্রতিটিরই এই পরিণতি ঘটবে।

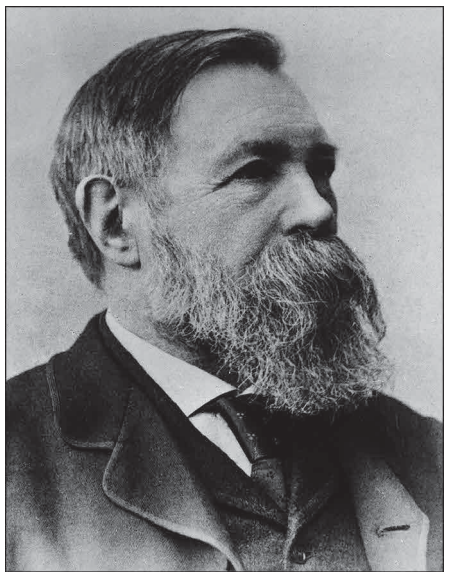

এ'রকম এক সৌরজগতের জীবন-ইতিহাস যখন সম্পূর্ণ হবে, যখন তা সসীম সকল বস্তুর শেষ পরিণতি মৃত্যুতে পৌঁছাবে, তারপর কী হবে? তারপর কি সূর্যের মৃতদেহটি মহাশূন্যের মধ্যে চিরকাল ধরে আবর্তিত হতে থাকবে এবং একদিন যেসব প্রাকৃতিক শক্তি অসীম বিচিত্র বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়েছিল, সেই সমস্ত শক্তি চিরকালের জন্য একটিমাত্র গতি রূপে, অর্থাৎ আকর্ষণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে?

না কি সেকি যেমন প্রশ্ন তুলেছেন,''প্রকৃতিতে কি এমন কোনও শক্তি আছে যা আবার মৃত জগতকে জ্বলন্ত নীহারিকার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে? তাকে আবার নবজন্মের জন্য জাগিয়ে তুলতে পারে? তা আমরা জানি না।''

দু'য়ে দু'য়ে চার হয় বা বস্তুর আকর্ষণ দূরত্বের বর্গফল অনুযায়ী কমে বা বাড়ে— এই নিয়ম আমরা যেভাবে জানি, সবকিছু আমরা সেভাবে জানি না। প্রকৃতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞান গড়ে তুলেছে তাকে বাদ দিয়ে আজ এমনকি চিন্তাহীন নিছক অভিজ্ঞতাবাদীও চলতে পারে না। সেই তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানে বহু সময়ে আধা-অজানা তথ্য নিয়ে চলতে হয়। এবং জ্ঞানের ত্রুটি সবসময়ই পূরণ করে নিতে হয় চিন্তার যুক্তিপূর্ণ সঙ্গতি দিয়ে। গতির অবিনশ্বরতার নীতিটি প্রকৃতিবিজ্ঞান নিয়েছে দর্শন থেকে। এই নীতি বাদ দিয়ে আজ প্রকৃতিবিজ্ঞান টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু বস্তুর গতি মানে শুধু যান্ত্রিক গতি নয়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া শুধু নয়। বস্তুর গতি মানে তাপ, আলো, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকশক্তি, রাসায়নিক সম্মিলন ও বিভাজন, প্রাণ ও সর্বশেষে চেতনা— এ সবই বস্তুর গতির নানা রূপ। যদি বলা হয়, অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান বস্তু তার চিরকালীন অস্তিত্বের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়ের জন্য মাত্র একবারই তার গতিকে বিশেষ রূপে প্রকাশ করেছে এবং তার মধ্যেই গতির সমস্ত সম্পদ প্রকাশ করেছে, এবং তার পূর্বে আর পরে বস্তুর গতি চিরকাল ধরে শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা বলার মানে দাঁড়ায়, বস্তু নশ্বর ও তার গতিও ক্ষণস্থায়ী। গতির অবিনশ্বরতাকে কেবল পরিমাণগত ভাবে নয়, গুণগতভাবেও বুঝতে হবে। বস্তুর যান্ত্রিক গতি ও স্থান পরিবর্তনের মধ্যেই অনুকূল পরিবেশে তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং প্রাণে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কিন্তু যে বস্তু নিজের ভেতর থেকে সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না, এ'রকম বস্তুর গতি 'বাজেয়াপ্ত গতি', যে গতির বিভিন্ন উপযোগী রূপে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, সে গতির তখনও 'ডায়নামিস' (সম্ভাব্যতা) থাকতে পারে বটে, কিন্তু 'এনার্জিয়া'(কার্যকারিতা) থাকে না, এবং তাই তা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। দুই-ই কিন্তু অকল্পনীয়।

এইটুকু নিশ্চিত যে, এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপটির পদার্থ এমন এক পরিমাণ গতিকে— সে গতিটি কী রকম তা অবশ্য এখনও আমরা জানি না— উত্তাপে রূপান্তরিত করেছিল, যা থেকে অন্তত দু'কোটি তারা সমেত (ম্যাডলারের মতানুযায়ী) বহু সৌরজগৎ বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল, যার ক্রমিক বিনাশও সমান নিশ্চিত। এই রূপান্তর কীভাবে হল? আমাদের এই সৌরজগতের ভবিষ্যৎ 'কাপুট মরটাম' (মূল্যহীন অবশেষ) আবার কোনও দিন নতুন সৌরজগতের কাঁচামালে পরিবর্তিত হবে কি না, সে বিষয়ে, ফাদার সেকি যেমন, আমরাও তেমনই খুব কম জানি। কিন্তু তাহলে, হয় আমাদের নির্ভর করতে হবে একজন সৃষ্টিকর্তার উপর, অথবা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমরা বাধ্য হব যে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগতের ভাস্বর কাঁচামাল প্রাকৃতিক উপায়ে, গতিশীল পদার্থের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবে অন্তর্নিহিত গতিরই রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। এবং তাই এই উদ্ভবের পরিস্থিতি অবশ্যই পদার্থ দ্বারাই পুনরায় সৃষ্টি হবে, এমনকি কোটি কোটি বছর পরে হলেও এবং কমবেশি আকস্মিক ভাবে হলেও, যে আকস্মিকতার মধ্যে নিহিত থাকে অবশ্যম্ভাবিতা।

এইরকম রূপান্তরের সম্ভাবনা ক্রমেই বেশি করে স্বীকৃত হচ্ছে। ক্রমেই এই ধারণায় আমরা পৌঁছাচ্ছি যে, জ্যোতিষ্কগুলি শেষপর্যন্ত একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাবে। সেই সংঘর্ষ থেকে কতটা তাপ উদ্ভূত হতে পারে তাও গণনা করে বের করা হচ্ছে। হঠাৎ করে কোনও নতুন তারার জ্বলে ওঠা অথবা পরিচিত তারার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যাওয়ার যে সব ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি, তা এই সংঘর্ষের ধারণা দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলিই শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না, আবার সেই সূর্যই কেবল মহাজাগতিক দ্বীপে ঘুরছে না, এমনকী মহাজাগতিক দ্বীপটাও মহাশূন্যে অন্যান্য মহাজাগতিক দ্বীপের সাথে সাময়িক ও আপেক্ষিক ভারসাম্য রক্ষা করে ছুটে চলেছে। কেননা, স্বাধীনভাবে গতিশীল বস্তুগুলির এমনকি আপেক্ষিক ভারসাম্যও তখনই থাকতে পারে, যখন বিভিন্ন গতি একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকেরই ধারণা মহাকাশের সর্বত্র তাপমাত্রা সমান নয়। আমরা এও জানি যে, অতি সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, মহাজাগতিক দ্বীপের অসংখ্য সূর্যের তাপ মহাশূন্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তার দ্বারা মহাকাশের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের লক্ষ ভাগের একভাগও বাড়ছে না। এই বিপুল পরিমাণ তাপ যায় কোথায়? মহাকাশকে উত্তপ্ত করার প্রয়াসে তা কি হারিয়ে যাচ্ছে? তার কি বাস্তব অস্তিত্ব আছে না কি তার অস্তিত্ব শুধু তত্ত্বে? এর দ্বারা মহাশূন্যের তাপ এক ডিগ্রির হাজার কোটি ভাগের একভাগ বেড়েছে— এটা মেনে নিলে গতির অবিনশ্বরতার নিয়মকেই অস্বীকার করা হয়। তাতে এই সম্ভাবনাই মেনে নেওয়া হয় যে, জ্যোতিষ্কগুলি ক্রমাগত একে অপরের উপর আছড়ে পড়ায় যাবতীয় যান্ত্রিক গতি তাপে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং তা মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে ধরে নিতে হবে 'শক্তির অবিনশ্বরতা'র নিয়ম থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সকল গতির অবসান হবে। (এ থেকে লক্ষ করা যায়, 'গতির অবিনশ্বরতা'র বদলে 'শক্তির অবিনশ্বরতা' বলাটা কত অসঙ্গত)। তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া তাপ কোনও ভাবে অন্য ধরনের গতিতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম, যে গতি আবার সঞ্চিত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। কীভাবে তা হয়, তা দেখানো হবে ভবিষ্যতের প্রকৃতিবিজ্ঞানের কর্তব্য। একমাত্র এই সিদ্ধান্ত নিলেই, নির্বাপিত সূর্যের আবার জ্বলন্ত বাষ্পে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধাটা দূর হয়।

তাছাড়া অন্তহীন কালে একের পর এক নতুন জগতের সৃষ্টি ও বিলোপের চিরন্তন পুনরাবৃত্তিই হল, অসীম মহাশূন্যে অসংখ্য জগতের একই সঙ্গে অবস্থানের ধারণার সঙ্গে যুক্তিসম্মত ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এই নীতির প্রয়োজনীয়তাকে ড্রেপারের মতো তত্ত্ববিরোধী ইয়াঙ্কি মস্তিষ্কও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ('অনন্ত মহাশূন্যে জগতের অসংখ্যতা থেকে এই ধারণাই আসে যে, অনন্তকালের ক্ষেত্রে জগৎসমূহের ক্রমপর্যায় চলেছে' ঃ ড্রেপার, 'ইউরোপের মনন বিকাশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড — এঙ্গেলসের টিকা)।

এ হল পদার্থের গতির এক চিরন্তন চক্র। এই চক্রের একপাক ঘুরতে যে বিশাল সময় লাগে তা মাপার পক্ষে জাগতিক বছর খুবই ছোট। এই চক্রের সর্বোচ্চ বিকাশ জৈবজগতের উদ্ভবকাল, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আত্মসচেতন এবং প্রকৃতি-সচেতন জীবের জীবনকালটুকু ঠিক তেমনই নগণ্য যেমন নগণ্য সেই জীবন ও আত্মচৈতন্যের ক্রিয়াক্ষেত্রটুকু। এই চক্রে বস্তুর প্রতিটি সুনির্দিষ্ট রূপ, তা সে সূর্যই হোক আর বাষ্পীয় নীহারিকাই হোক, একটা প্রাণীই হোক আর প্রাণীর একটা বর্গই হোক, রাসায়নিক সংযোজনই হোক বা বিয়োজন— সবই সমান ক্ষণস্থায়ী, কিছুই চিরন্তন নয়। চিরন্তন কেবল চিরকালীনভাবে গতিশীল পদার্থ এবং তার গতি ও পরিবর্তনের নিয়মগুলি। কিন্তু স্থান ও কালের মধ্যে যত বার ও যত অবিরাম ভাবে এই চক্র পরিপূর্ণ হোক না কেন, কোটি কোটি সূর্য ও পৃথিবীর উদ্ভব ও বিলোপ হোক না কেন, জৈবজীবন উদ্ভবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন, জীবের মধ্যে থেকে স্বল্পকালের জন্য জীবনধারণের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ পেয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব ও পরে নির্মমভাবে ধ্বংস হওয়ার আগে যত অসংখ্য রকমের জীবের বিকাশ ও বিনাশ ঘটুক না কেন, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে সমস্ত ধরনের রূপান্তরের মধ্যে পদার্থ চিরকাল একরকমই থেকে যায়, তার কোনও বৈশিষ্ট্যই কখনও হারিয়ে যেতে পারে না এবং সেই কারণেই যে অমোঘ অবশ্যম্ভাবিতায় তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি— চিন্তাশীল মননকে নিশ্চিহ্ন করবে, সেই একই অমোঘ অবশ্যম্ভাবিতায় অন্য কোনও স্থানে, অন্য কোনও কালে আবার তার উদ্ভব ঘটাবে। (শেষ)

সূর্যই হোক আর বাষ্পীয় নীহারিকাই হোক, একটা প্রাণীই হোক আর প্রাণীর একটা বর্গই হোক, রাসায়নিক সংযোজনই হোক বা বিয়োজন— সবই সমান ক্ষণস্থায়ী, কিছুই চিরন্তন নয়। চিরন্তন কেবল চিরকালীনভাবে গতিশীল পদার্থ এবং তার গতি ও পরিবর্তনের নিয়মগুলি।

এনআরসি বিরোধিতায় নাগরিক সমাবেশ জেলায় জেলায়

কৃষ্ণনগর ঃ শহরের পৌরসভা হলে ১১ জানুয়ারি এক নাগরিক কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, নাট্যব্যক্তিত্ব সহ অনেক বিশিষ্ট মানুষ। মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলীকে সম্পাদক ও আফতাবুদ্দিন সেখকে সভাপতি করে ২৩ জনের এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি কৃষ্ণনগর শাখা গঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

হাওড়া ঃ ১১ জানুয়ারি হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, অ্যাডভোকেট, সমাজকর্মী সহ সর্বস্তরের শতাধিক বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সম্পাদক অংশুমান রায়। কনভেনশন থেকে জাতীয় ফুটবলার সুব্রত চ্যাটার্জীকে সভাপতি এবং তাপস বেরাকে

হাওড়া

সম্পাদক করে এনআরসি বিরোধী হাওড়া জেলা নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর ঃ এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী নাগরিক কনভেনশন হল মেদিনীপুর শহরের রেডক্রস সোসাইটি হলে ১১ জানুয়ারি। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাগরিক রামতোষ মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন আইনজীবী

গৌতম মল্লিক, প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি মহম্মদ আবু সালেহ, প্রধান শিক্ষক সৌকত আলি, প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্র বেরা। দীপক পাত্রকে সম্পাদক, রামতোষ মুখার্জীকে সভাপতি করে মেদিনীপুর শহর এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর শহর

তমলুক ঃ জনস্বার্থ বিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টিকারী এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিলের দাবিতে তমলুকের মানিকতলা মোড়ে অবস্থান-বিক্ষোভ সংগঠিত হল শিল্পী সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ এবং এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি ও সিপিডিআরএস-এর যৌথ উদ্যোগে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সঞ্জীব কুইলা, আইনজীবী ময়ূখময় অধিকারী, সৈয়দ মালেকুজ্জামান, সাংবাদিক মানিক মাইতি, সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য কমিটির সদস্য জীবন দাস প্রমুখ। সভায় শতাধিক বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়ি ঃ ১৮ জানুয়ারি এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর প্রতিবাদে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

শিলিগুড়ি

হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হলে। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকি, নাট্য পরিচালক পার্থ চৌধুরী, শিক্ষক নৈয়ার আলম, ডাঃ শাহরিয়ার আলম, অশোক ছেত্রী, অধ্যাপক অজিত কুমার রায়, পলক চক্রবর্তী, রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, অধ্যাপক বিকাশরঞ্জন দেব, রজি আহমেদ, অরুণ রাহা প্রমুখ। আইনজীবী অরুণপদ রাহাকে সভাপতি এবং আবুল কাশেম ও দীপ্তি রায়কে যুগ্মসম্পাদক করে ৪৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

পূর্ব বর্ধমান ঃ ৩ জানুয়ারি বর্ধমান টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন। উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস সহ জেলার বিশিষ্ট নাগরিক। সভাপতিত্ব করেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯, এনআরসি, এনপিআর বাতিলের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনজীবী সৈয়দ মুজতবা আলিকে সভাপতি ও অরবিন্দ সাহাকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বর্ধমান টাউন হল

কলকাতায় কনভেনশন

একের পাতার পর

এনআরসি নাগরিক জীবনে কী ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি করেছে তা আসামের মানুষ জানেন। সেই এনআরসির থেকেও সিএএ-র পরিকল্পনা আরও ভয়ঙ্কর। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায় এনআরসির বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সভাপতি। কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি তার গোপন অ্যাজেন্ডা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে। ৩৭০ ধারা বিলোপ, এনআরসি-সিএএ সবকিছু এই পরিকল্পনারই অংশ। এই বিপদকে মোকাবিলা করতে হলে বিষয়টিকে ভাল করে যেমন

কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ। বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী (ইনসেটে)। ১৪ জানুয়ারি

নিজেদের বুঝতে হবে, তেমনি ব্যাপক প্রচার করে গ্রামে শহরে মানুষকে বোঝাতে হবে। তিনি সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি প্রকাশিত বাংলা ও হিন্দি বইটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট কবি এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শেহনাজ নবি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই আন্দোলনে মানুষ এভাবে রাস্তায় নেমে এসেছে কারণ তারা প্রায় সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেছে। ৩৭০ ধারা বিলোপ, অযোধ্যা নিয়ে অনৈতিহাসিক রায়েও তেমন প্রতিবাদ হচ্ছে না দেখে সরকার ভেবেছিল যা খুশি তাই করে নেবে। কিন্তু তা হতে পারেনি এটা খুবই আনন্দের।

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক সমাজকর্মী গোপাল বিশ্বাস বলেন, এনআরসি-তে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গরিব মানুষই সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হবেন। ভাল করে এই আইনটিকে বুঝলে দেখা যাবে বিজেপি হিন্দুদের উপকারের নামে আসলে হিন্দু শরণার্থীদের বিপাকে ফেলতে চলেছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যাঁরা এত বছর সমস্ত নাগরিক অধিকার ভোগ করছেন, ভোট দিচ্ছেন, চাকরি-ব্যবসা করছেন, তাঁদের এখন সব অধিকার ছেড়ে নিজেকে শরণার্থী ঘোষণা করে সরকারের মর্জির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে! তিনি এই আইন প্রতিরোধের ডাক দেন।

বক্তারা বলেন, আমাদের সকলকে নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে কেন? তাহলে আমাদের ভোটে জিতে যারা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা কি অনাগরিকদের ভোটে জিতেছেন? তাহলে তাঁরা পদত্যাগ করুন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। কনভেনশন থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইউ এন সরকারকে সভাপতি এবং অংশুমান রায়কে সম্পাদক করে কলকাতা জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণ

১২ জানুয়ারি মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণ দিবস এআইডিওয়াইও এবং এআইডিএসও-র উদ্যোগে রাজ্যের সর্বত্র পালন করা হয়। ছবি ঃ বেহালা

মোটরভ্যান চালকদের রাজ্য সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের রাজ্য সম্মেলন ১৩ জানুয়ারি কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় ও রাজ্য জুড়ে লাগাতার আন্দোলনের চাপে বিগত এবং বর্তমান

সরকার মোটরভ্যান চলু রাখতে দিতে বাধ্য হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের এক রায়ের অজুহাতে বিভিন্ন জেলায় পুলিশ ব্যাপকভাবে মোটরভ্যান চালক সহ গাড়ি আটক করে ও কেস দেয়। এর বিরুদ্ধে 'সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন' আন্দোলন গড়ে তুলে প্রশাসনকে আটক মোটরভ্যান ছাড়তে বাধ্য করে। কিন্তু এখনও বহু জেলায় মোটরভ্যানকে আটক করা হচ্ছে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের হুমকি চলছে। কোচবিহার সহ কয়েকটি জেলায় টোটো বাতিল করে ই-রিক্সা দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে সরকার মোটরভ্যান বাতিল করে ই-রিক্সা চালুর পরিকল্পনা করছে। জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আরটিও মোটরভ্যান চালকদের টিন নম্বর (অস্থায়ী পরিচয় নম্বর) দিচ্ছে না। বলছে, মোটরভ্যান ছেড়ে দিয়ে ই-রিক্সা চালাতে। কিন্তু মোটরভ্যানের কাজ কখনও ই-রিক্সার দ্বারা সম্ভব নয়। প্রতিবেদনের উপর মোটরভ্যান চালকরা আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুজিত ভট্টশালী। সম্মেলন থেকে কমরেড অশোক দাসকে সভাপতি, কমরেড দীপক চৌধুরীকে সম্পাদক করে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি-র তৃতীয় হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় গুরগাঁওতে। সম্মেলনে কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের গৃহ-নির্মাণ শ্রমিক, মনরেগা শ্রমিক, গ্রামীণ চৌকিদার, ঝাড়ুদার, অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিল কর্মী সহ সকল প্রকার শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি ও সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সত্যবানের পতাকা উত্তোলন এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড হরিপ্রকাশ সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দের শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়।

প্রকাশ্য অধিবেশনে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজেন্দ্র সিং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব মজবুত করে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আবেদন করেন। প্রধান বক্তা কমরেড সত্যবান বলেন, আট লাখ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র হোডা সহ অটোমোবাইল শিল্পে তিন লাখ আশি হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। বিজেপির মোদি সরকার রেল, বিএসএনএল এর মতো সরকারি পরিসেবার ক্ষেত্রগুলিকে বৃহৎ পুঁজিপতির হাতে তুলে দিচ্ছে, ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা সরকার চালু করছে না, সরকার পুঁজিপতিদের লাভের পাহাড় বৃদ্ধি করতে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট স্কিম' এর পরিবর্তে শ্রম অধিকার হরণকারী 'হায়ার এন্ড ফায়ার' চালু করতে চলেছে। চাষি ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যখন সব শ্রেণির জনগণ প্রতিবাদে মুখর তখন তাদের মধ্যে ঐক্য ভাঙতে জাত-পাত, ধর্ম ভাষা, প্রাদেশিকতার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর এর মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকার জনসাধারণকে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঈশ্বর সিং রাঠী।

আসামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চার দফা সমাধান সূত্র কার্যকর করতে হবে

আসাম চুক্তির ৬ নং ধারা কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে, এসইউসিআই (সি) আসাম রাজ্য কমিটি মনে করে, এর দ্বারা আসামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা মারাত্মক বিপদাপন্ন হবে। কমিটির অধ্যক্ষের বিচার বিবেচনার জন্য এসইউসিআই (সি) আসাম রাজ্য কমিটি ১৬ জানুয়ারি আসাম পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্রে চার দফা সমাধান সূত্র কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে।

স্মারকপত্রে ১৯৮০ সালের ১ মার্চ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সর্বদলীয় সভায় এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে তুলে ধরা চার দফা সমাধান সূত্রের উল্লেখ করে কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বলেছেন, সীমান্ত পার হয়ে লক্ষ লক্ষ বিদেশির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ঘটছে, এই ধারণা সঠিক নয় বলে জেনেও আমরা বলেছিলাম, জনগণের উদ্বেগ নিরসন করার জন্য সীমান্ত এমনভাবে সিল করে দেওয়া হোক যাতে অনুপ্রবেশের কোনও ফাঁক না থাকে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সাথে কোনও ধরনের সম্পর্ক না রেখে এবং ছোট-বড় সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অক্ষুন্ন রেখে, রাজ্য ভাষা হিসাবে অসমিয়া ভাষার বর্তমান মর্যাদা স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় করার জন্য পার্লামেন্টের বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন করা হোক। তৃতীয়ত আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যসূচির একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম ঘোষণা করা এবং চতুর্থত, ১৯৭১ সালকে বিদেশি চিহ্নিতকরণের ভিত্তি বছর হিসাবে গ্রহণ করা হোক।

এস ইউ সি আই (সি) মনে করে, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কারণ বিভাজনবাদ কোনও অবস্থাতে আসামের বিন্দুমাত্র স্বার্থ পূরণ করবে না। আসামের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা করতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বৈদ্যুতিকীকরণ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, কৃষির আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণ এবং বেকার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ অতি সত্বর গ্রহণ করতে হবে।

ঘাটশিলা কলেজে এনআরসির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ

জেএনইউতে এবিভিপির বর্বর হামলার প্রতিবাদে ঘাটশিলা কলেজে ছাত্রবিক্ষোভ । ৬ জানুয়ারি

কৃষকদের নিয়ে তামাসা

সংখ্যাটি বিরাট। ১২,০০০০০০০০০০। বারোর পরে দশ-দশটি শূন্য, দেখলেই মাথা ঘুরে যায়। ১২০০০০০০০০০০ অর্থাৎ বারো হাজার কোটি। কীসের সংখ্যা? টাকার। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই এত টাকা মহান সম্রাট মোদিজি দেশের চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন! বিশ্বাস হচ্ছে না? টিভি, রেডিও, খবরের কাগজে এত ঢালাও প্রচার হচ্ছে— সে সব আপনি দেখতে-শুনতে পাচ্ছেন না? কেমন লোক মশাই আপনি?

এই এত টাকা দান করে নাঙ্গা ফকির হয়ে আগামী চব্বিশ সালে তিনি ভব-বৈতরণী পার হয়ে যাবেন। শুনে, তাঁর দিশি-বিলিতি ভক্তরা ধন্যি ধন্যি করছে। কর্ণাটকের এক সভায় তিনি ঘোষণা করেছেন, এই টাকা কৃষকদের হাতে তুলে দেবেন। দেশব্যাপী এত ঢাক-ঢোল-কাঁসরের শব্দের মধ্যে একটু খটকা লাগলো।

বারো হাজার কোটি টাকা ছ'কোটি চাষির মধ্যে বিলি করলে মাথা পিছু কত পড়ে? ছোটবেলায় শেখা সরল পাটিগণিতের অঙ্ক কষে দেখা গেল, দু'হাজার টাকা, সারা বছরের জন্য।

ঘোষণা শুনেই চাষিরা বলবলি করছে— এর একটা অংশ প্রশাসনের ইতিউতি ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে। পুঁজিবাদী এই দেশে সরকারি অভিধানে 'কৃষক' বলতে ধরা হয় জোতদারদের। বাকি টাকার একটা বড় অংশ যাবে তাদেরই পেটে। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের টাকা সরকারের হাত ঘুরে যাবে বড়লোকদের ঘরে। এত ছাঁকনি গলে ক'টা টাকা পাবে গরিব চাষিরা? কষ্ট করে সে অঙ্ক আর নাইবা কষলাম। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী না করে অসম্মানজনক ভিক্ষুকের জীবনযাপনে বাধ্য করার এই বীভৎস তামাসা আর কতদিন চলবে?

পাঠকের মতামত

অধ্যাপকের জাতবিচার!

গত নভেম্বর মাসে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি।

অনেকের হয়ত মনে পড়বে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র একটা বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন একজন অধ্যাপকের পদত্যাগের দাবিতে। প্রথমে মনে হয়েছিল ছাত্ররা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার্থে কোনও অযোগ্য শিক্ষক, যিনি কোনও নেতা-মন্ত্রীর হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন তাঁর পদত্যাগের দাবিতেই ছাত্ররা আন্দোলনে। ভাল লাগছিল এই ভেবে যে এখনও এদের মেরুদণ্ড সোজা রয়েছে, অন্যায়ের কাছে আপস করতে শেখেনি। কিন্তু খবরের ভেতরে গিয়ে দেখলাম, ছাত্ররা লড়ছেন এই জন্য যে ওই অধ্যাপক একজন মুসলিম হয়েও কোন অধিকারে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করবেন? মনটা ব্যথায় ভরে গেল। ছোটবেলার স্কুল জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। জন্মসূত্রে আমি উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তান। আমাদের সময় স্কুলে একটা নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘ কোনও ছুটির অবকাশে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-অশিক্ষক সবাইকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতাম। শিক্ষক মহাশয়রা কে কোন জাতের, এ ভাবনার কোনও জায়গা ছিল না। শুধু তাই নয়, আমার খুব মনে আছে কুসুম পিসির কথা। কুসুম ঘড়াই, স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারী ছিলেন। তিনি কিছুতেই আমার প্রণাম নেবেন না। একে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তার উপর প্রধান শিক্ষকের ছেলে। কিন্তু আমার বাবার হস্তক্ষেপেই অত্যন্ত সংকুচিত হয়েই কুসুম পিসিকে প্রণাম গ্রহণ করতে হত। এই তো প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি! অথচ এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে যাঁরা ঘোষণা করে চলেছেন, সেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের যাঁরা সদস্য, তাঁদের এ কী আচরণ!

রাতে ঘুম এল না। একে একে মনে পড়ে গেল অতীত ইতিহাসের কথা। ১৯৩৯ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও আবুল কালাম আজাদ গিয়ে হাজির হয়েছেন হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে। তখন নিজাম মির ওসমান আলি খান। দেশের প্রথম বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেদিন এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন তিনি। যদিও এর কিছু দিন বাদে তিনিই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তা ছাড়াও বেনারস সহ বহু হিন্দু মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত দান করতেন তাঁরা। এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৫ সালে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ওই নিজাম দান করেছিলেন ৫০০০ কেজি সোনা। আজ যারা দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা সেদিন ব্রিটিশদের পদলেহন ছাড়া আর কী ভূমিকা পালন করে ছিলেন আমার জানা নেই। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই এই ইতিহাস সামনে আসা দরকার।

তমাল নন্দ, কলকাতা

‘সরকার যা ভাবে, তার থেকে মানুষের শক্তি অনেক বেশি’

সাক্ষাৎকারে কান্নন গোপীনাথন

১৪ জানুয়ারি কলকাতা জেলা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী নাগরিক কনভেনশনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগী আইএএস অফিসার কান্নন গোপীনাথন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভার ফাঁকে তিনি গণদাবীকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেটি এখানে প্রকাশ করা হল।

গণদাবী ঃ এই আন্দোলনে আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিশেষত ভারতের বহু জায়গায় আপনিই এই এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছেন। আন্দোলন শুরুর কথা কীভাবে মনে এল?

কান্নন গোপীনাথন ঃ আমি তা মনে করি না। বস্তুত কাশ্মীরের প্রশ্নেও আমি ভেবেছি গণতন্ত্রে বিরুদ্ধ মতের একটা প্রকাশ অবশ্যই ঘটা দরকার। বহু মানুষ সরকারের এই পদক্ষেপকে ভ্রান্ত মনে করেছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। এনআরসি নিয়ে বিভিন্ন শহরে নানা জায়গায় বহু জনের কাছে আমি অনুরোধ করেছি প্রতিবাদ শুরু করার জন্য। কিছু মানুষ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেছেন। নানা ভাবে প্রতিবাদ হয়েছে। এটাই ছিল সূচনা।

কাশ্মীর নিয়ে সরকার যা করেছে তার তুলনায় এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আরও বড় বিপদ ডেকে আনছে। আমি মনে করি এমনকি সরকারও জানে, এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন একত্রে খুবই বিপজ্জনক।

আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই আন্দোলনের কথা ভাবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। এক সভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আমি কিছু কথা বলেছিলাম। এক ছাত্রী আমায় প্রশ্ন করল, কী বাক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছেন— আমি আজ নাগরিক, কাল নাগরিক থাকব কি না তারই কোনও নিশ্চয়তা নেই! আমার নাগরিকত্বই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। তখনই আমি বুঝলাম আমার কাছে এর কোনও উত্তর নেই। নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকির ফলে মানুষ বিপন্ন বোধ করছে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবায় যে, কিছু একটা করা দরকার।

কলকাতায় এই আন্দোলন আগেই শুরু হয়েছে। কিন্তু সারা দেশে মানুষের মধ্যে এনআরসি-সিএএ ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতা ছিল না। মানুষ বিষয়টা বুঝতে শুরু করতেই তাদের ভাবনা আসে যে একে রুখতে হবে। এটা এত বড় এক বিপদ যে, আপনি যদি একবার বিষয়টা বোঝেন তাহলে ঘরে আরামে বসে থাকা আপনার পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়।

আপনি কি মনে করেন ৩৭০ ধারা বিলোপ, এনআরসি-সিএএ চালু এগুলি একই পরিকল্পনার অংশ?

আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ জীবনের মূল সমস্যা বলে যা মনে করে, বিজেপির কাছে সেগুলি মূল নয়। মানুষের জীবনে মূল বিষয় হচ্ছে কর্মসংস্থান, অর্থনীতি এই সমস্ত। অন্যদিকে বিজেপি বা আরএসএসের সামনে মুখ্য বিষয় হচ্ছে ৩৭০ ধারা, এনআরসি, সিএএ ইত্যাদি। তাদের লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্রের পথে হাঁটা। তারা আমাদের জীবনের মূল বিষয়গুলি থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চাইছে। এ জন্যই তাদের থামাতে হবে। শুধু ভোটের কথা ভেবে ওরা করছে এমন ভাবলে ভুল হবে। চাকরি বা অন্যান্য সুবিধা দিতে পারলে তো ওরা ভোট পেতই। কিন্তু আমাদের দেশের এবং জাতির ভিত্তিগত ক্ষেত্রেই ওরা আঘাত করেছে। একে যে কোনও মূল্যে রুখতে হবে। এটা শুধু ভোট রাজনীতির বিষয় নয়। ভারত বলতে যা আমরা বুঝি, সেই ধারণাটাকেই বদলে দেওয়ার, সেকুলার ভারতের ধারণাকেই ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর ফলে কে কিছু বেশি ভোট পাবে, কে ভোট হারাবে, এসব প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

আমার মনে হয় স্বাধীনতার পর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির বিতর্কেই বিষয়টির সূচনা। যে সমস্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ পাকিস্তানে চলে গিয়েও পরে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের প্রথমে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কিছুই না পেয়ে তাঁরা ফিরে আসেন। প্রশ্ন উঠেছিল তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কি না? কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে বিতর্ক হয়েছিল আমরা কি কেবলমাত্র পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেব, না সকলকে দেব? কিন্তু সেখানে এমন মানুষ ছিলেন, যাদের এই দেশের মূল ধারণার সাথে সম্যক পরিচিতি ছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি না। সিদ্ধান্ত হয়, যাঁরাই ভারতে বাস করছেন, ভারতে জন্মেছেন, তাঁরাই ভারতের নাগরিক। তাঁদের ধর্মপরিচয় কী, পাকিস্তানে কী ঘটছে এগুলি আমাদের দেখার দরকার নেই। কিন্তু দু'জন মানুষ এই প্রশ্নগুলি তুলতে থাকলেন। সেই দু'জনের আদর্শগত উত্তরাধিকারীরাই এখন ক্ষমতায় বসেছেন। তাঁদের সামনে এখন এই কর্মসূচি পূরণ করাটা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেদিন যুক্তির সামনে এই চিন্তা পরাজিত হয়েছিল, ওরা পারেনি। এখন সরকারে বসে করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সরকার যা ভাবে মানুষের শক্তি তার থেকে অনেক বেশি।

৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধে আজকের মতো জোরালো প্রতিবাদ হল না দেখেই কি এই পদক্ষেপ নিতে সরকার সাহস পেয়েছে?

ঠিকই, এটা ছিল পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। এই দেখেই ওরা ভেবে নিয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্র এখন তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ওরা ভেবেছিল সব ভারতীয়ই হয় লোভী, না হলে সরকারকে দেখে ভীত। ভেবেছিল মানুষকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখালে আর ভয় দেখালেই তাদের বশ করা যাবে। কিন্তু একবার যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়— আমরা জেলকে ভয় করি না, তারা যখন টাকার লোভকে জয় করে, তখন সরকারের হাতে করবার মতো কিছুই থাকে না।

এই আন্দোলনে অনেক দিন পর আবার হাজারে হাজারে মানুষ বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামছে। মায়েরা শিশু সন্তান কোলে রাস্তায় রাত কাটাচ্ছেন। শিক্ষকরা ছাত্রদের বলছেন, বই মুখে দিয়ে বসে থাকার সময় নয় এটা, রাস্তায় যাও। আপনার কী মনে হয়?

শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? শিক্ষার উদ্দেশ্য তো নিছক অধ্যয়ন নয়। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের চলার প্রক্রিয়াকে জানা, সমস্ত কাজের পিছনে যুক্তিকে বোঝা। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বুঝতে পারা। ভুল ঠিককে বুঝতে শেখা, যে কোনও সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণ করা শুধু নয়, অন্যায় হলে তাকে প্রতিরোধ করতে শেখাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভুল-ঠিক বিচার করতে সবচেয়ে ভাল পারে ছাত্ররাই। কারণ তারা নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র ঠিক-বেঠিক ধারণার ভিত্তিতেই তা করতে পারে। কিন্তু বয়স হলে চাকরির ভয়, ট্রান্সফারের ভয়, ব্যবসার ক্ষতির ভয়, আমার সুনির্দিষ্ট জীবযাত্রায় ছেদ পড়ার ভয়, ঠিক-বেঠিক বিচারের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। বলব, কি বলব না, ভাবনা এসে যায়। কিন্তু ছাত্ররা এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার। তাদের হারাবার কিছু নেই, কিন্তু পাওয়ার আছে অনেক কিছু।

আপনি কি মনে করেন এই আন্দোলন জয়ী হবে?

আন্দোলন হচ্ছে, এটাই গণতন্ত্রের একটা নিশ্চিত জয়। কিন্তু আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ নেই। শহরে বসে আমরা যা ভাবছি, তাকে গ্রামেও নিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিপরীত পক্ষও বসে নেই। তারা বিভাজনকে বাড়ানোর চেষ্টাই করছে, আরও বেশি করবে।

সরকারকে মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। এটাই এই আন্দোলনের বিরাট সাফল্য। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের পর এই আন্দোলনে সমস্ত স্তরের মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, খেটে-খাওয়া মানুষ, সিনেমার তারকা, শিল্পী, হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলেই রাস্তায়। আমি গর্বিত যে আমি এই জাগরণের একটা অংশ হতে পেরেছি। এই জাগরণটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একটা অসাধারণ ছবি দেখা যাচ্ছে, একজন ভারতীয় মুসলমান একই সাথে ভারতীয়ত্ব এবং তাঁর মুসলমানত্ব প্রকাশ করছেন। দেশে ২০ কোটি মুসলমান আছেন কিন্তু সাধারণ সময় তাঁরা যেন অদৃশ্য হয়ে থাকেন। আমরাও এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। আমরা তাঁদের এগিয়ে আসতে দিই না। কিন্তু এখন আমরা পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছি। বলি হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, কিন্তু দশজন মুসলমানের সাথে এক ঘরে থাকতে হলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু এখন তা কেটে যাচ্ছে। অন্তত বলা যায়, এসব জিনিস থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছি আমরা। এটা একটা বিরাট পাওনা। ছাত্ররা এগিয়ে এসে নতুন করে ভাবাচ্ছে— কাকে বলে গণতন্ত্র। এই সমস্ত কিছুর সদর্থক প্রভাব আমাদের উপর পড়ছে। আমাদের সারা দেশের উপরই এই সদর্থক প্রভাব কাজ করবে। এই দিক থেকে দেখলে এই আন্দোলনের মূল্য আমাদের কাছে অসীম। এবং আমি পুরোপুরি নিশ্চিত আমরা সফল হব।

কনভেনশনে আপনি বলেছেন, আইনি পথটাই সব নয়, নির্ণায়ক শক্তি হল জনগণ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা— তিনি বলতেন, মনুষ্যত্ব অর্জনের একমাত্র রাস্তা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসা। আপনি কী মনে করেন?

ঠিক বলেছেন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। জরুরি অবস্থার থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, তাকে চালিয়ে নিয়ে যেত হবে। এর যে গতিশীলতা তাকে ব্যবহার করেই আমরা সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারি। এর মধ্য দিয়েই বোঝানো যাবে কেন আমাদের বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই যা এই ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণাকে আটকাতে পারে।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৬)

কর্মাটাঁড় ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের শরীর খারাপ শুনে হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য একদিন দেখা করতে এলেন তাঁর সাথে, কলকাতায় বাদুড়বাগানের বাড়িতে। তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'কর্মাটাঁড়ে (বর্তমান ঝাড়খণ্ডে) থাকলে তো আপনি ভাল থাকেন। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকুন না।' কর্মাটাঁড়ের কথায় বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ নীরব হয়ে গেলেন। চোখ তাঁর ছলছল করে উঠল। তারপর, নিজেকে কোনও মতে সংবরণ করে তিনি বললেন, 'আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকত তা হলে সেখানে গিয়েই থাকতাম। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কই? ওখানে গিয়ে আমি একা খাওয়া-দাওয়া করবো, আর চারদিকে দরিদ্র সাঁওতালরা না খেয়ে মরবে— এ কি সইতে পারি?' এই বলতে বলতেই বিদ্যাসাগরের চোখ থেকে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। বাস্তবে, যে হৃদয়বিদারক দারিদ্র্য তিনি কর্মাটাঁড়ে জনসাধারণের মধ্যে দেখেছেন, তাতে অসহনীয় কষ্ট পেয়েছেন।

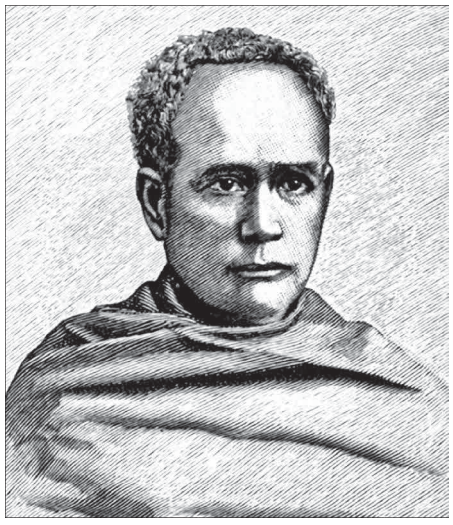

কেউ কেউ এমন মনে করেন, তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত ভদ্রসমাজ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, মানসিক শান্তির সন্ধানে বিদ্যাসাগর কর্মজগৎ থেকে বহু দূরে কর্মাটাঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি মেলে না।

এ কথা ঠিক, বিদ্যাসাগর নানা সময়ে নানা জনের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন, ঠকেছেন, প্রতারিত হয়েছেন। এজন্য তাঁর মনের এক কোণায় যন্ত্রণা জমে ছিল এবং সে যন্ত্রণার কথা কারও কারও কাছে অল্পবিস্তর প্রকাশও হয়েছে। কিন্তু সে কারণে জীবনে কোনও দিন এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয়-নিস্পৃহ হওয়ার কথা মনে ঠাঁই দেননি তিনি। এটা তাঁর অন্যতম এবং অসাধারণ এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনও কারণেই, কোনও অবস্থাতেই তিনি কর্তব্য থেকে বিরত হননি। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনযাপনে রয়েছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দু-একটা স্মরণ করা যেতে পারে। বন্ধু দুর্গামোহন দাসকে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ১১৬৩)। আরেকবার, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়।" (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ১৩ নং অধ্যায়, পৃ. ২৯৪)। ফলে, বিদ্যাসাগরের মতো কর্মনিষ্ঠ মানুষ কয়েকজন ঠগ-প্রতারকের জন্য হতাশ হয়ে কর্মজগৎ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেবেন, এটা ঘটনা হতে পারে না।

কর্মাটাঁড়ে বাড়ি কেনার পিছনে বিদ্যাসাগরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত আরও গভীর পড়াশুনা। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফল হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে যথার্থভাবে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটাবার জন্য আরও জ্ঞানসাধনার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু নানা কাজে পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তার ওপর, ১৮৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হলেন তিনি। তাঁর পরিশ্রম করার অমিত শক্তি অনেকটা খর্ব হয়েছিল তাতে। তা সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত সামাজিক কাজে বিদ্যাসাগর বিশেষ ভূমিকা পালন করছিলেন। কিন্তু পড়াশুনায় ডুবে থাকার আগ্রহ সর্বদা মনে জেগে থাকত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-কে একবার খুব আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কই তা' হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।"

বিপুল প্রতিপত্তির সময়ও কলকাতায় বিদ্যাসাগরের নিজের কোনও বাড়ি ছিল না। একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সেখানে পড়াশুনার সুবিধা ছিল না, এমনকি বইপত্র রাখারও জায়গা হচ্ছিল না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তিনি খোঁজ পেলেন কর্মাটাঁড়ে অল্প দামে একটি বাড়ি বিক্রি আছে। এক ইংরেজ মহিলা ওই বাড়িটি বানিয়েছেন। এখন তিনি সেই বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে বরাবরের জন্য ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন। গাছ-গাছালি ঘেরা নির্জন বাড়িটি দেখে বিদ্যাসাগরের পছন্দ হয়ে গেল এবং তিনি বাড়িটি কিনে ফেললেন (১৮৭৩)।

বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য এখানে থেকে পড়াশুনা আর লেখালিখির কাজ করবেন। কিন্তু এখানে এসে তিনি দেখতে পেলেন অন্য এক জগৎ। হতদরিদ্র, অসহায়, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জগৎ থেকে আরও পিছিয়ে থাকা এক জনগোষ্ঠী, কয়েক ঘর বাঙালি এবং সাঁওতাল আদিবাসী। চোখের সামনে এই অন্যতর জগৎ দেখে বিদ্যাসাগরের বুক টনটন করে উঠল, চোখের জল সামলাতে পারলেন না তিনি, কেঁদে ফেললেন মানুষগুলির জীর্ণ শীর্ণ রিক্ত চেহারার দিকে চেয়ে। তারপর যথারীতি তিনি লেগে পড়লেন ওই মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে, অন্তত তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে। আর, তখনই হয়তো বিদ্যাসাগর মনে মনে বলেছিলেন, পড়াশুনা করার সাধ আর এজন্মে মিটলো না। প্রসঙ্গত, ১৮৭৬ সালে কলকাতার বাদুড়বাগানে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি তিনি কেনেন, বইপত্র রাখার জন্য। তাঁর সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। পরবর্তীকালে এই বাড়িতেই তাঁর পরিবার এসে উঠেছিল।

কর্মাটাঁড়ের বাসিন্দা সাঁওতাল আদিবাসীদের বিদ্যাসাগর হৃদয় উজাড় করে ভালবেসেছিলেন। তাদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, "ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালোবাসি।" তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র ১৮৭৫ সালে কর্মাটাঁড়ে গিয়ে থেকেছিলেন কয়েকদিন। পরবর্তীকালে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "দাদা (বিদ্যাসাগর) প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরী প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করেন।... পরে পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিতেন, অপরাহ্ণে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণকুটীরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটীরে যাইলে তাহারা সমাদরপূর্ব্বক বলিত, 'তুই আসেছিস!' তাহাদের কথা অগ্রজের (বিদ্যাসাগরের) বড় ভাল লাগিত।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, একদিন সকালে এক সাঁওতাল কিছু ভুট্টা নিয়ে এসে বলল, 'এনে বিদ্যাসাগর, এগুলো রেখে পাঁচগণ্ডা পয়সা দে আমায়। নইলে আমার ছেলের চিকিৎসা হবে না।' বিদ্যাসাগর ভুট্টা নিয়ে তাকে পয়সা দিলেন। এরপর আবার একজন এল ভুট্টা নিয়ে। বলল, 'আমার আটগণ্ডা পয়সা দরকার।' বিদ্যাসাগর আবার ভুট্টা নিয়ে পয়সা দিলেন। এভাবে আরও কয়েকজন এল। হরপ্রসাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত ভুট্টা নিয়ে আপনি কী করবেন?' বিদ্যাসাগর বললেন, 'দেখবি রে দেখবি।' তারপর হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পর হরপ্রসাদ দেখলেন, একটা আলপথ ধরে হনহন করে হেঁটে আসছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর কপাল থেকে দরদর করে ঘাম পড়ছে, হাতে একটা পাথরের বাটি।

—কোথায় গিয়েছিলেন এভাবে? বিদ্যাসাগর বললেন, 'ওই যে এক সাঁওতালী এসছিল। বলল, ওর ছেলের নাক দিয়ে হু-হু করে রক্ত পড়ছে। তাই ওষুধ দিয়ে এলাম।' হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদূর গিয়েছিলেন?' যেন খুব কাছেই, এমনভাবে বিদ্যাসাগর বললেন, 'মাইল দেড়েক হবে।' হরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। তারপর দেখলেন, দলে-দলে সাঁওতালরা বিদ্যাসাগরের উঠোনে ভিড় করছে। তারা বলছে, 'বিদ্যাসাগর, খেতে দে।' বিদ্যাসাগর সবাইকে সকালের কেনা ভুট্টা পরিবেশন করলেন। তারা শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে ভুট্টা পুড়িয়ে খেল।

এই হলেন বিদ্যাসাগর। দরিদ্র মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে তুলনাহীন হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ইন্দ্র মিত্রের বইতে পাই— "সাঁওতালদের দু-হাত ভরে দিতেন বিদ্যাসাগর। ওষুধ-বিষুধ, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল, থালা-গেলাস-ঘটিবাটি, যে যা চাইত, দিতেন। একবার কার্মাটাঁড়ে (ইন্দ্রমিত্র এই বানানই লিখেছেন) পৌঁছতেই তো ছোট-ছোট সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বিদ্যাসাগরকে ঘিরে ধরল— দাদা, আমাদের জন্য কি এনেছিস? আগেই অবশ্যি ওরা বিদ্যাসাগরকে ফরমাস দিয়ে রেখেছে। ওদের ফরমাস মাফিক জিনিসপত্র এসেছে তো? আরশি কই? চিরুনি কই? ঘুনসি কই? বিদ্যাসাগর হেসে বললেন— সব এনেছি। সব দিচ্ছি। একে একে সকলকে দিলেন। চিরুনি দিলেন, ঘুনসি পরিয়ে দিলেন। তারপর বাগান থেকে গোলাপ ফুল নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। সব মেয়ের মাথায়, কানে গোলাপ ফুল পরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের আনন্দ, ওদেরও আনন্দ।"

শুধু ছোটদের নয়, যে যা চাইত, ধারদেনা করে হলেও বিদ্যাসাগর তা জোগাড় করার চেষ্টা করতেন। কলকাতা থেকে নিজে তাদের জন্য নিয়মিত জামাকাপড়, ফল, ওষুধ ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেতেন তিনি। ওই হতদরিদ্র মানুষগুলি হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত আপনজন। বলাই বাহুল্য, তাঁর দান কখনই দরিদ্রের প্রতি ধনীর কৃপা ছিল না। বরং তা ছিল একজন মানুষ হিসাবে আর্ত-বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আন্তরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, যা এড়িয়ে যেতে বিদ্যাসাগরের বুক ফেটে যেত। তাই, সাঁওতালরাও তাঁকে আপনার লোক হিসাবে চিনেছিল, হৃদয় দিয়ে বুঝেছিল। তারা তাঁকে যখন খুশি বাড়িতে ডাকত। বিদ্যাসাগর চলেও যেতেন, মাটিতে বসে পরমানন্দে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতেন, গল্প করতেন। তারা বিদ্যাসাগরের কাছে এতটাই নিজের লোক ছিল যে, তিনি তাদের হাতে আলমারির চাবিও দিয়ে দিতেন। বলতেন, 'দেখ কি আছে, কি নিবি নিয়ে যা।'

আবার, শুধু দানধ্যান নয়। তাদের জীবনের যথার্থ উন্নতির জন্য সেখানে স্কুল তৈরি করেছেন বিদ্যাসাগর। শ্রমজীবী মানুষের জন্য নৈশস্কুল তৈরি করেছিলেন। নিজে থেকে স্কুলগুলির সমস্ত খরচ বহন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বাড়ি-বাড়ি যখন তিনি ঘুরতেন তখন ছোট ছোট ঘরোয়া বৈঠক করে বাল্যবিবাহের দোষ, বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার্জনের গুরুত্ব সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করে বোঝাতেন। কর্মাটাঁড়ে প্রায় ২৪ জন বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

প্রায় সতের বছরের কর্মাটাঁড়পর্ব এভাবেই কেটেছে বিদ্যাসাগরের। কোথাও কোনও হতাশা বা মানসিক ক্লান্তির প্রসঙ্গ দেখা যায়নি। এই পর্বে তিনি, এমনকি সারা রাত জেগেও, বিস্তর লেখালিখি করেছেন। ইংরেজদের সাহায্য ছাড়াই মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলেছেন এবং তাকে ক্রমশ বিকশিত করেছেন। এছাড়াও অগণিত সামাজিক কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। (চলবে)

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
প্রভাস ঘোষ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

২৩ জানুয়ারি
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এনআরসি-সিএএ বিরোধী গণঅবস্থান

মধ্য কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্পাদক, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। ৯ জানুয়ারি।

বেলগাছিয়ার সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ ঝোটন দাস। ১৮ জানুয়ারি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেউলবাড়িতে মানব-বন্ধন। ২০ জানুয়ারি

আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় মানববন্ধন। ২০ জানুয়ারি

শিশুপাচার ঃ রায়গঞ্জে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে পাচার হওয়া আদিবাসী শিশুদের উদ্ধারের দাবিতে পার্টির রায়গঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ জানুয়ারিরায়গঞ্জ থানায় বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেড মাধবীলতা পাল, বিপ্লব কর্মকার, রুবিনা খাতুন এবং কমরেড লক্ষ্মীরাম টুডু। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ডিএসপি রায়গঞ্জ। তিনি অতি দ্রুত পাচার হওয়া শিশুদের উদ্ধার করবেন বলে জানান। ১০ দিনের মধ্যে পাচার হওয়া শিশুরা উদ্ধার না হলে দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

জেএনইউ-তে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে আইনজীবীরা

৫ জানুয়ারি জেএনইউতে ছাত্রী হোস্টেলে ঢুকে এবিভিপি দুষ্কৃতীরা ছাত্রী-শিক্ষিকাদের উপর যে বর্বর হামলা চালিয়েছে তার প্রতিবাদে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ৭ জানুয়ারি এবং ৯ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট (ছবি), আলিপুর জজকোর্ট এবং পুলিশ কোর্ট সহ রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে প্রচার ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি লিখিত বিবৃতি রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালকে পাঠানো হয়।

সেভ এডুকেশন কনভেনশন ত্রিপুরায়

জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই শিক্ষার বেসরকারিকরণ করছে। এর ফলে শিক্ষা হয়ে উঠছে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, যে কারণে সাধারণ ঘরের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা অসাধ্য হয়ে উঠছে। এ ছাড়া সিলেবাসের মধ্যে আরএসএস-বিজেপির দলীয় চিন্তা ধারার অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে সেকুলার শিক্ষা। জনবিরোধী এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ১১ জানুয়ারি আগরতলায় সেভ এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ডঃ অলোক শতপথী, পূর্ণিমা রায়, হরকিশোর ভৌমিক, সুবোধ সরকার, অসিত দাস, সুরজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সুভাষকান্তি দাস, কমল রায়চৌধুরী। কনভেনশন থেকে সুভাষকান্তি দাসকে সভাপতি, অসিত দাসকে সম্পাদক এবং হরকিশোর ভৌমিককে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র হামলা
প্রতিবাদে ডিএসও-র বিক্ষোভ

১৫ জানুয়ারি রাতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবন সিনিয়র বয়েজ হোস্টেলে এবিভিপি আশ্রিত গুণ্ডারা প্রবেশ করে ছাত্রদের উপর নৃশংস হামলা চালায়। দু'জন ছাত্র এই হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়েক এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা মনে করি এই ঘটনা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। গত ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সিএএ-র সমর্থনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তের বক্তৃতার বিরোধিতা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিনিধিরা। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্ষিপ্ত হয়েই হামলা চালিয়েছে আরএসএস-এর সংগঠন এবিভিপি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ

গোটা দেশ জুড়ে যে ধর্মীয় বিভাজন বিভাজন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, তাতে দেশের ছাত্র সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিজেপির নেতৃত্বে অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হামলা চালাচ্ছে।

তিনি ছাত্রসমাজ সহ সকল অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

এই হামলার প্রতিবাদে এআইডিএসওর ডাকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্ররা।

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী
স্টল নং ৩৭৫

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com